# রোহিঙ্গা আগমনের ৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সিসিএনএফ'র বিবৃতি

২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট মায়ানমার সেনাবাহিনীর অবর্ণনীয়-নির্মম গণহত্যা থেকে বাঁচতে বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নেয় ৭ লাখ ৭৩ হাজার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী। গত জুলাই পর্যন্ত নিবন্ধিত রোহিঙ্গার সংখ্যা ৯ লাখ ৩৬ হাজার ৭৩৩ জন। তবে সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সূত্রে মোট রোহিঙ্গার সংখ্যা ১২ লাখ বলে জানানো হয়েছে, প্রতিবছর ৩০ হাজার শিশু জন্মে মোট এই সংখ্যাটি দাঁড়িয়েছে। আজ, ২৫ আগস্ট ২০২২ সেই ভয়াবহ দিনটির ৫ বছর পূর্তি হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের নেতৃত্বে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন স্থানীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক সংস্থা আশ্রিত এই বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন মানবিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। প্রথমদিককার কর্মসূচি ও ব্যবস্থাপনার তুলনায় বর্তমান সময়ের ব্যবস্থাপনা ও কর্মসূচিতে ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন আছে, কিন্তু এরপরেও এখনো রোহিঙ্গা কর্মসূচিতে অনেক বিষয়েই অনেক ঘাটতি রয়ে গেছে। সেই ঘাটতি পূরণ করার মাধ্যমে মানবিক কর্মসূচিটিকে অধিকতর কার্যকর করা সম্ভব, আশ্রয়দানকারী স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ করে অতি দ্রুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য টেকসই প্রত্যাবসন সম্ভব। সংশ্লিষ্ট কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে সিসিএনএফ'র এই বিবৃতি।

**১. সবার আগে দ্রুত প্রত্যাবসন: জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে এটা হতে হবে অগ্রাধিকার। এই বিষয়ে সরকারের কৌশল কী?**

সম্প্রতি পররাষ্ট্র সচিব আশা প্রকাশ করেছেন যে, আগামী ডিসেম্বর থেকে রোহিঙ্গা প্রত্যাবসন শুরু হতে পারে। গত ৭ জুলাই জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন মায়ানমারের প্রতি রোহিঙ্গাদের সম্মানজনক প্রত্যাবসন নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়ে রেজুলেশন গ্রহণ করেছে। এই আশাবাদ এবং রেজুলেশন সাধুবাদের দাবিদার নিশ্চয়ই। কিন্তু এখন পর্যন্ত প্রত্যাবসনের অগ্রগতি নিঃসন্দেহে হতাশাজনক, এই বিষয়ে জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় মায়ানমারের উপর পর্যাপ্ত চাপ প্রয়োগেও ব্যর্থ বলে আমাদের পর্যবেক্ষণ।

এর আগে বাংলাদেশ সরকার এবং মায়ানমার মধ্যে কিছু যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিলো। কোভিড -১৯ মহামারী এবং মিয়ানমারে সামরিক অভ্যুত্থান সেই উদ্যোগগুলোকে বাধাগ্রস্ত করে। দুই দেশের সংলাপ-আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রত্যাবসন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে রোহিঙ্গাদের যাচাইকরণ শুরু হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এক্ষেত্রে মায়ানমারের কার্যক্রম খুবই ধীরগতির, জানুয়ারি ২০২২ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রেরিত রোহিঙ্গাদের বায়োমেট্রিক তথ্যের ৮৩০,০০০ সেটের মধ্যে মাত্র ৪২,০০০টি যাচাই করেছে।

আমরা মনে করি, রোহিঙ্গাদেরকে ফিরিয়ে নিতে, তাদের নাগরিকত্ব ও নিরাপত্তা প্রদানে মায়ানমারের উপর চাপ প্রয়োগে জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ভীষণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। জাতিসংঘ তাঁর নিজস্ব কাঠামোর কারণে মায়ানমারের বিরুদ্ধে কঠোর কোনও ব্যবস্থা নিতে পারছে না, এক্ষেত্রে কিছু প্রভাবশালী রাষ্ট্রের ভূমিকা দু:খজনক। প্রভাবশালী বেশিকিছু রাষ্ট্র মায়ানমারের সুস্পষ্ট পক্ষপাতিত্ব করছে। আর তাই এই সময়ে এসে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের একমাত্র অগ্রাধিকার হতে হবে মায়ানমারের উপর চাপ প্রয়োগ করে রোহিঙ্গা প্রত্যাবসন নিশ্চিত করা। মায়ানমারের এই সংকটের দায় কোনভাবেই বাংলাদেশের নয়, অথচ বাংলাদেশকে এই দায়ভার বহন করছে। এই দায়ভার থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করার দায় অবশ্যই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের।

**২. রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে যুব সমাজকে ক্যাম্পের ভিতর অর্থবহ কাজে ব্যস্ত রাখতে হবে:**

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রায় ৪০ থেকে ৫০% শিশু ও যুব সমাজ। বিরাট এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে মানবাধিকার-গণতন্ত্রের শিক্ষা সম্প্রসারণ

প্রয়োজন। বিশেষ করে যুব সমাজকে অর্থবহ বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যস্ত রাখা খুবই প্রয়োজনীয়, এটা করা সম্ভব হলে যুব সমাজের মধ্যে এক ধরনের আশা-আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা যাবে এবং এর জন্য প্রয়োজন মায়ানমার কারিকুলামের শিক্ষা। প্রয়োজন কারিগরি শিক্ষা। যুব সমাজকে কারিগরি শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হলে এরা মায়ানমারে ফিরে গেলেও কর্মসংস্থান সহজ হবে। বিরাট এই যুব সমাজকে ক্যাম্পের ভিতরে বিভিন্ন ধরনের আয়-উপার্জনের সুযোগ করে দিলে বৈদেশিক সহায়তার উপর নির্ভরতাও কমানো সম্ভব।

### ৩. পরিবেশ পুনরুদ্ধারে নিশ্চিত করতে হবে বিশেষ তহবিল (এনভায়রনমেন্ট পুল ফান্ড)

রোহিঙ্গাদেরকে আশ্রয় দিতে গিয়ে চাপে পড়েছে পুরো কক্সবাজারের পরিবেশ। আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে মূলত পাহাড় এবং বনভূমির উপর। একটি হিসাব থেকে জানা গেছে যে, প্রায় দুই হাজার একর পাহাড় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আর্থিক ক্ষতি প্রায় ২০০ কোটি টাকা। আর এসব পাহাড় ও সরকারি জমিতে সামাজিক বনায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রায় দেড় হাজার পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত, পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত হয়নি তাঁদের জন্য। স্থানীয় এলাকার পরিবেশ পুনরুদ্ধারে বিশেষ তহবিল জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজন। এই তহবিল পরিবেশ পুনরুদ্ধারে এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য বরাদ্দ করার জন্য আশু উদ্যোগ প্রয়োজন।

উখিয়া এবং টেকনাফের অনেক এলাকাতেই পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে, এর কারণ প্রায় ১২ লাখ মানুষের প্রয়োজন মেটাতে ভূগর্ভস্থ পানির উপর চাপ বেড়েছে। আমরা অনেক আগে থেকেই পানির বিকল্প উৎস অনুসন্ধানের আহ্বান জানিয়ে এসেছি। ভূ-উপরিস্থ পানি, বিশেষ করে নাফ নদীর পানি শোধন করে এবং প্রাকৃতিক পানি সংরক্ষণ করে তা ব্যবহার এর উত্তম বিকল্প হতে পারে। প্লাস্টিক পরিবেশের জন্য অন্য আরেকটি বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুরো ক্যাম্পজুড়ে প্লাস্টিকের ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দিতে হবে।

### ৪. রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সিএসও এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি অবহেলা কেন?

রোহিঙ্গা কর্মসূচি ব্যবস্থাপনাকে কার্যকর করতে একেবারেই শুরু থেকেই স্থানীয়করণের দাবি করে আসছে স্থানীয় সুশীল সমাজ। গ্রান্ড বারগেন মিশন এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করেছে, লোকালাইজেশন রোডম্যাপ নামের একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে জাতিসংঘের নেতৃত্বাধীন লোকালাইজেশন টাস্ক ফোর্স। কিন্তু স্থানীয়করণের সেই রূপকল্প বা রোডম্যাপটির আলোকে কোনও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনায় মূল সমন্বয়ের কাজটি করছে আইএসজি, আইএসজি'র কার্যক্রমে স্থানীয় সংস্থাগুলোর অংশগ্রহণ, বিশেষ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর নেতৃত্ব একেবারেই অপ্রতুল।

রোহিঙ্গা কর্মসূচির নানা পরিকল্পনায় স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর অংশগ্রহণ অপরিহার্য। কিন্তু স্থানীয় জনপ্রতিনিধিবৃন্দ বিভিন্ন সময় অভিযোগ করে আসছেন যে, তাঁদের এলাকার জন্য গ্রহণ করা পরিকল্পনাতে তাঁদের অংশগ্রহণ অনেকক্ষেত্রে নেওয়া হয় না।

কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনা সমন্বয়ের লক্ষ্যে গঠিত আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ফোরাম হেড অব সাব অফিস গ্রুপ হলো HoSoG। এই গ্রুপের প্রায় সবাই আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি, সম্প্রতি সেখানে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব দেওয়ার নামে অগণতান্ত্রিকভাবে এমন দুটো সংস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যেগুলো আন্তর্জাতিক তো বটেই, অন্যদিকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব বাছাই করা হয়েছে স্থানীয় বা জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে কোনও পরামর্শ ছাড়াই।

রোহিঙ্গা কর্মসূচিকে কার্যকর করতে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি এ ধরনের অবহেলা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ের কর্মসূচি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

### ৫. স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রতি অবহেলা নয়

২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী কক্সবাজারে এলে সবার আগে স্থানীয় জনগোষ্ঠীই তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছিলো। স্থানীয়দের জন্য রোহিঙ্গা কর্মসূচির ২৫% অর্থ ব্যবহারের কথা থাকলেও এরকম অর্থ ব্যয়ের কোনও কিছু আমাদের কাছে দৃশ্যমান হচ্ছে না। রোহিঙ্গাদের জন্য অনেক কর্মসূচি নেওয়া হলেও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহীত কর্মসূচি খুবই অপ্রতুল। রোহিঙ্গাদের শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হলেও তেমন উদ্যোগ নেই স্থানীয়দের শিক্ষার উপর। অথচ অনেক ছাত্রছাত্রী ক্যাম্পে এখনো বিভিন্ন পদে চাকরি করছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার বেড়ে গেছে, রাস্তাঘাটে যানবাহনের চলাচল বেড়ে যাওয়ায় অনেক শিশুরই স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং আমরা মনে করি, ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য অবশ্যই রোহিঙ্গা কর্মসূচির মোট তহবিলের ২৫% ব্যয় করতে হবে।

রোহিঙ্গা শিবিরগুলো উখিয়া এবং টেকনাফে থাকলেও, পুরো কক্সবাজারই এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত। তাই ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় জনগোষ্ঠী হিসেবে শুধু উখিয়া বা টেকনাফকে বিবেচনা না করে, পুরো কক্সবাজার জেলার মানুষকেই বিবেচনা করতে হবে।

**৬. মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচি বাস্তবায়নে নেতৃত্বে থাকতে হবে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো:**

স্থানীয়করণের মূল কথাই হচ্ছে স্থানীয় পর্যায়ে স্থানীয়দের নেতৃত্ব। কিন্তু রোহিঙ্গা কর্মসূচি বাস্তবায়নে দেখা যাচ্ছে উল্টো চিত্র। এখানে ২০১৭ সালে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় নেওয়ার পর আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর উপস্থিতি বেড়ে গেছে প্রায় ২৩৬৭%! দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন দেশীয় এনজিওর উপস্থিতি বেড়েছে ৯৬৭%। কর্মসূচিগুলো মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে কম। একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, ১৮% প্রকল্পের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের অংশীদারিত্ব রয়েছে আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর সঙ্গে, স্থানীয়দের সঙ্গে অংশীদারিত্ব তুলনামূলকভাবে খুবই কম মাত্র ৮%।

আমরা মনে করি স্থানীয় পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় এনজিও, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর নেতৃত্ব থাকলে কম খরচে অধিক সেবা দেওয়া সম্ভব। আর অংশীদারিত্ব নির্বাচনের একটি নির্দিষ্ট নীতিমালা থাকতে হবে। অংশীদার নির্বাচিত হতে হবে সেই নীতিমালার আলোকে, প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে। বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, অংশীদার বাছাই করা হচ্ছে ইচ্ছেমতো, কারো অংশীদার হওয়ার আবেদন নাকচ হলে তার কারণও যথাযথভাবে জানানো হচ্ছে না। এই পরিস্থিতির পরিবর্তন করতে হবে।

**৭. কমে যাচ্ছে অর্থ সহায়তা: ভাবতে হবে বিকল্প**

রোহিঙ্গা কর্মসূচিতে অর্থ সহায়তা চাহিদার তুলনায় এখানো অপ্রতুল। ২০১৭ সালে চাহিদার তুলনায় অর্থ সহায়তা বেশি হলেও (১১৪%), এর পরে কোনও বছরই চাহিদা মোতাবেক অর্থ সহায়তা পাওয়া যায়নি। ২০১৮ সালেই অর্থ সহায়তা দাঁড়ায় চাহিদার ৮২%, ২০২১ সালে সেটি ছিলো ৮১%, আর ২০২২ সালের জুলাই পর্যন্ত পাওয়া গেছে মাত্র ২১%।

আর একারণেই আমাদের ভাবতে হবে কম অর্থে বেশি সেবা দেওয়ার উপায়। জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর পরিচালন খাতে একটি বড় অর্থ ব্যয় হয়ে যায়, তাই মাঠ পর্যায়ে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর কার্যক্রম কমানো গেলে পরিচালন ব্যয় কমানো সম্ভব। এছাড়াও প্রয়োজনীয় ব্যয় ঠিক রেখে কমাতে হবে বিলাসী খরচ তথা প্রচুর গাড়ি ব্যবহার, বিলাসবহুল হোটেলে আবাসন ইত্যাদি খাতে খরচ কমানো যেতে পারে।

**৮. আন্তজার্তিক এনজিও এবং জাতিসংঘ সংস্থার পরিচালনা ব্যয় খুবই বেশিঃ স্থানীয়করণ হতে পারে বিকল্প সমাধান**

সম্পতি এক গবেষণায় দেখা গেছে, ২০২১ সালে রোহিঙ্গা কর্মমূচিতে মোট অর্থ এসেছে ৭৬১.৭ মিলিয়ন ডলার। হিসেব অনুযায়ী রোহিঙ্গা পরিবার প্রতি বছরে ৩৯৪৯ ইউএস ডলার অর্থ এসেছে। এই অর্থের মাত্র ৪২.৪% অর্থ খাদ্য, বাসস্থান নির্মাণ, পুষ্টি, পানি ও স্যানিটেশন, এলপিজি বিতরণ এবং অন্যান্য খাতে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতি রোহিঙ্গা পরিবার বছরে পেয়েছে ১৬৭৬ ইউএস ডলার। কিন্তু ৫৭.৬% অর্থ পরিচালনা ব্যয়সহ সেবামূলক খাতে ব্যবহার হয়েছে। হিসেব অনুযায়ী, আন্তজার্তিক এবং জাতিসংঘ সংস্থার পরিচালনা ব্যয় খুবই বেশি।

এর সমাধান হিসেবে স্থানীয়করণের বাস্তবায়ন হতে পারে সবচেয়ে বিকল্প সমাধান। স্থানীয় সরকার, স্থানীয় এনজিও এবং সিএসও এর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করলে পরিচালনা ব্যয় অনেক কমে যাবে। যার মাধ্যমে রোহিঙ্গা এবং স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্থ বাংলাদেশী জনগোষ্ঠীর সর্বোচ্চ কল্যাণ সাধন করা সম্ভব।

সচিবালয়: কোস্ট ফাউন্ডেশন

মেট্রো মেলোডি (দ্বিতীয় তলা), বাড়ি ১৩, সড়ক ২, শ্যামলী, ঢাকা।

ইমেইল: **info@coastbd.net** ওয়েবসাইট: **www.coastbd.net**